



ଅଧ୍ୟାୟ ୭  
ଜୀବଜଗତ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ জীবজগতের বৈচিত্র্য
- ✓ জীবের ক্ষুদ্রতম একক কোষ এবং তার গঠন
- ✓ জীবের শ্রেণিবিন্যাস

## ৬.১ কোষ

কখনো কী তোমার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছ এগুলো কী দিয়ে তৈরি? অথবা ওই যে স্কুলের আঙিনায় বড় গাছটি, কিংবা পরিচিত পুকুর বা ড্রাইংরুমের অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো—এরাই বা কীভাবে তৈরি হলো এমন আকার আর আকৃতিতে?

আমাদের চারপাশের যা কিছু দেখি তাদের মধ্যে যাদের জীবন আছে তাইরাই বিজ্ঞানের পরিভাষায় জীব হিসেবে পরিচিত। সব জীবকে আমরা দেখতে পাই না। উপরে যাদের কথা বললাম—তাদেরকে আমরা খালি চোখেই দেখি। আর কেউ কেউ আছে যাদেরকে আমরা খালি চোখে দেখি না। এদেরকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। একটু পরেই আমরা এই যন্ত্র সম্বন্ধে জানব।

তোমার স্কুলের ভবনটির কথা ভাবো। একতলা হোক বা পাঁচতলা, এই ভবনটি কিন্তু তৈরি হয়েছে একের পর এক ইট গেঁথে। তাই ইটগুলোকে আমরা বলতে পারি ভবন তৈরির একক। ঠিক এমনিভাবে আমাদের জানা অজানা যত ছোট ও বড় জীব আছে তাদেরও গঠনের মূলে রয়েছে কিছু গাঠনিক একক। তোমার সম্পূর্ণ শরীর, প্রিয় পোষা প্রাণী কিংবা মাঠের গাছ সবকিছুর গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ওই এককসমূহ।

বিজ্ঞানের ভাষায় জীবের আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রতম একক যা জীবদেহের গঠন ও কাজে যুক্ত থাকে তাকেই কোষ বলা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আরো কিছু বিষয় জেনে নেবো এই অধ্যায়ে।

অনেক জীব আছে যারা কেবল একটি কোষ নিয়েই গঠিত। এদেরকে আমরা বলি এককোষী জীব। এককোষী (unicellular) জীবদেহের সমস্ত জৈবিক কাজ একটি কোষের মধ্যেই হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে Bacterium এবং বহুবচনে Bacteria) এবং প্রোটোজোয়া (Protozoa) এককোষী জীবের উদাহরণ। এককোষী জীব হলো সরলতম জীব।

আর একটু আগে যে বড় বড় জীবের উদাহরণ তোমরা দেখেছিলে (মাছ, গাছ, মানুষ), এরা তৈরি হয় বহু কোটি কোষ দিয়ে। তাই এদেরকে বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব।

কোষ সম্বন্ধে আমাদের এই যে ধারণা, তা কিন্তু খুব বেশি আগে জানা ছিলো না।

চারপাশের নানান জীব কী দিয়ে, কীভাবে গঠিত হয়, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছেন। জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি উপায় বের করার জন্য বহু বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা চালান। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় মাইক্রোস্কোপ

(microscope) বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর ফলে খালি চোখে দেখা যায় না এমন অত্যন্ত ছোট জীবকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রথম দিককার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে আজকের যুগের যন্ত্রগুলো অনেক উন্নত ধরনের এবং দিনদিন জীবজগতের নতুন সব রহস্য উদ্ঘাটন করছে। ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বৃহত্তম বট গাছ বা অতিকায় নীল তিমি পর্যন্ত সমস্ত জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কাজের মূলে রয়েছে কোষ। মানবদেহ প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন (সাইত্রিশ লক্ষ কোটি বা ৩৭,০০০,০০০,০০০,০০০) সংখ্যক কোষ দিয়ে তৈরি।



ছবিতে ব্যাকটেরিয়া

বৃহদাকার জীবদেহেও ছোট আকারের অসংখ্য কোষ থাকে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যদি বিভিন্ন কোষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে যে বিভিন্ন কোষের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। কিছু কোষ লম্বাকৃতির, কিছু দেখতে গোলাকার কিংবা দণ্ডাকার, আবার কিছু দেখতে হয়তো ব্যাঙাচির মতো। কিছু কোষ আছে যার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অর্থাৎ এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।

জীবজগতের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তিক বিভিন্ন কাজে কোষগুলো যুক্ত থাকে। কাজের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী জীবে কোষের আকৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। বহুকোষী একটি জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সব ধরনের কোষেরই সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, একটি জীবদেহে সকল কোষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

বহুকোষী জীবগুলোও কিন্তু একটি কোষ থেকেই তৈরি হয়। যেমন, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ, তাদের শুরু কিন্তু হয়েছিল একটিমাত্র কোষ থেকে—যার নাম অবিভক্ত বা আদি জ্রণ কোষ বা জাইগোট (zygote)। এই একটি জাইগোট কীভাবে শেষ পর্যন্ত ট্রিলিয়ন কোষের বিরাট সংখ্যায় পরিণত হলো? এর উত্তর জানা যাবে কোষের বিভাজন প্রক্রিয়ার বিষয়টি জানলে।

বহুকোষী জীবের একটি পরিণত দেহকোষ এক পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি কোষ তার জেনেটিক উপাদানসহ সমস্ত উপাদান দ্বিগুণ করে দুটি অভিন্ন কোষ গঠনের জন্য বিভক্ত হয়। প্রতিটি

ভাগেই সকল উপাদান সমানভাবে চলে আসে। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ থেকে দুটি, দুটি কোষ থেকে চারটি, চারটি কোষ থেকে আটটি, আটটি কোষ থেকে ষোলটি—এভাবে নতুন নতুন কোষ তৈরি হয়। এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবের শরীরের বৃদ্ধি ঘটে।

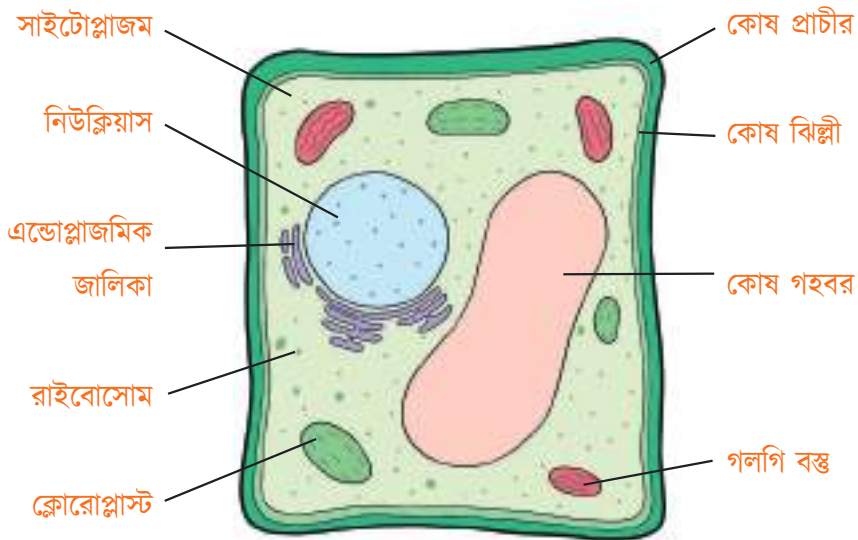
ধরো, তোমার দেহে এখন ২০ ট্রিলিয়ন (বিশ লক্ষ কোটি, অর্থাৎ  $2 \times 10^{13}$ ) কোষ আছে। সবসময় কিন্তু এত কোষ তোমার দেহে ছিল না। আমরা প্রত্যেকেই একটি কোষ হিসেবে জীবন শুরু করেছি। সেই কোষটি বিভাজিত হয়েছে, আকার-আকৃতিতে বেড়েছে, এবং এক সময় আবার বিভাজিত হয়েছে। আমরা সেই শিশুকাল থেকে বড় হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছি কারণ আমাদের কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়েছে।

## ৬.২ কোষের গঠন ও কাজ



প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের তিনটি প্রধান কাঠামো রয়েছে: নিউক্লিয়াস (nucleus), কোষ ঝিল্লি (cell or plasma membrane) এবং সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—ব্যাকটেরিয়া কোষ, যার কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই, সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকায় এদের বলা হয় প্রোক্যারিয়ট (Prokaryote) বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ। অপরদিকে, যেসব কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে তাদের বলা হয় ইউক্যারিয়ট (Eukaryote) বা সুকেন্দ্রিক কোষ। নিউক্লিয়াস সাধারণত গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হয়। এটি কোষের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। নিউক্লিয়াস

একটি কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেহের মস্তিষ্ক যেমন সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ধারণ করে, নিউক্লিয়াসও তেমনি কোষের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সমস্ত জৈবিক কাজ পরিচালনার তথ্য নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা ডিএনএ (DNA)-এর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।



ছবি: উদ্ভিদকোষ



নিউক্লিয়াসের নিজস্ব ঝিল্লি বা আবরণ (nuclear membrane) আছে, যা একে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ থাকে। একে কোষঝিল্লি বলা হয়। কোষঝিল্লি কোষকে ঘিরে রাখে এবং কোষের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। কোষঝিল্লি নমনীয় হয়। তবে উদ্ভিদ কোষে কিন্তু এই ঝিল্লিটির চারদিকে আরো একটি তুলনামূলক শক্ত আবরণ থাকে। একে কোষপ্রাচীর (cell wall) বলা হয়। কোষপ্রাচীরের জন্যই উদ্ভিদ কোষ তুলনামূলকভাবে একটু শক্ত হয়ে থাকে। কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষকে আকৃতিও প্রদান করে। প্রাণীকোষে কোনো কোষপ্রাচীর থাকে না। উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরের একটি প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ (cellulose)। সেলুলোজ একটি নির্জীব উপাদান যা কোষকে রক্ষা করে এবং আকৃতি প্রদান করে। কাঠের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ। শুধু উদ্ভিদ কোষেই সেলুলোজ থাকে। প্রাণীকোষে কোনো সেলুলোজ থাকে না।

আমরা শুরুর দিকে কোষের বিভিন্ন আকার আকৃতি নিয়ে কথা বলেছি। কোষ কীভাবে তার আকৃতি ঠিক রাখে? এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আগে তোমাদের মনে করিয়ে দিই—আমাদের দেখা প্রাণীদের গঠন এবং আকৃতির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে তাদের কঙ্কাল। যেমন, মানবদেহে কঙ্কাল না থাকলে এমন সুনির্দিষ্ট গঠন থাকতো না। আবার, কিছু প্রাণীতে দেহের বাইরে একটি শক্ত খোলস থাকে, যেমন, গলদা চিংড়ি। এই খোলসও প্রাণীর আকৃতি প্রদানে ভূমিকা রাখে।

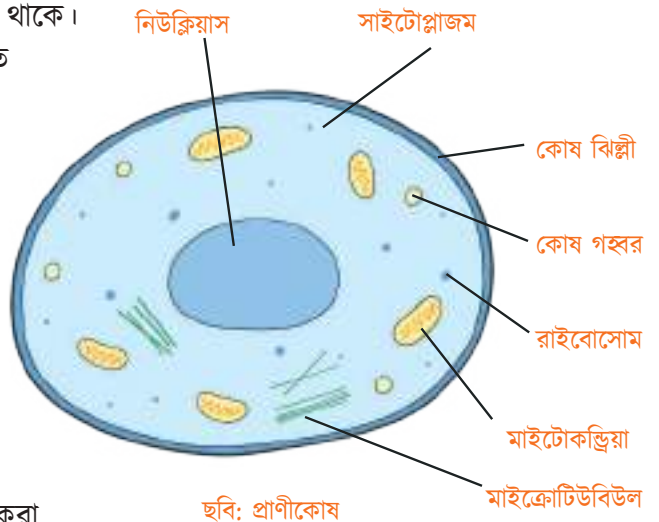
আমাদের অভ্যন্তরীণ কঙ্কাল আমাদের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং অঙ্গগুলিকে সঠিক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন কোষের আকৃতি এবং তাদের অঙ্গাণু ঠিক রাখতে তাদের সাইটোপ্লাজমের ভেতরে আণুবীক্ষণিক নলের মতোন গঠন দেখা যায়, এদের মাইক্রোটিউবিউল বলে।

আমাদের যেমন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি কোষেরও নানা উপাদান গ্রহণ করতে হয়। আবার ঠিক আমাদের মতোই কোষের বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থগুলিকে দূর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। এসব কোষের আকার-আকৃতি তাদের কাজের ধরনের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ কোষে কোষগহ্বর নামক বড় ফাঁকা জায়গা

থাকে যেখানে পানি, বর্জ্য ও খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

এটি উদ্ভিদকে সোজা দণ্ডায়মান রাখতে সাহায্য করে। কোষগহ্বরে পানিশূন্যতা হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে।

বহুকোষী জীবে কোষগুলো কিন্তু একা একা কাজ করে না। বরং প্রায়ই এক গুচ্ছ কোষ একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। এমন কোষগুচ্ছ যারা দেখতে একই রকম এবং একই কাজে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে টিস্যু বা কলা বলা হয়। কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন টিস্যুর নামকরণ করা



হয়। যেমন: প্রাণীদেহে পেশী, ত্বক, হাড়, রক্ত এবং স্নায়ু হলো বিভিন্ন ধরনের টিস্যু। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত এবং এসব কোষ জীবদেহের কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে যুক্ত থাকে।

এককোষী জীব কাজের দিক দিয়ে অনেকটাই বড় বহুকোষী জীবের মতোন হয়। প্রতিটি কোষেই এমন সব গঠন থাকে যা একটি সম্পূর্ণ জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

## ৫.৬ জীবের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবী একটি প্রাণবন্ত গ্রহ। এখানে এমন সব জায়গায় জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যা কল্পনারও অতীত। সাগরের তলদেশের গরম আগ্নেয়গিরি মুখ থেকে শুরু করে অ্যাসিডপূর্ণ উষ্ণ ঝরনা থেকেও অতিক্ষুদ্র জীব পাওয়া যেতে পারে। কিছুকাল আগে বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকায় ২০ বছর ধরে শুষ্ক নদীর নিচে বেঁচে থাকা অণুজীবের সন্ধান পান। যখন সেখানে পানি পৌঁছায়, মাত্র একদিনের মাথায় সেগুলোতে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ একটি সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়! তখন গবেষকদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি মঙ্গল গ্রহের শুষ্ক, শীতল পৃষ্ঠেও এমন জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে?

এই ছোট তথ্যগুলো থেকেই বোঝা যায়, জীববিজ্ঞান একটি আকর্ষণীয় এবং কখনও কখনও আশ্চর্যজনক বিষয়।

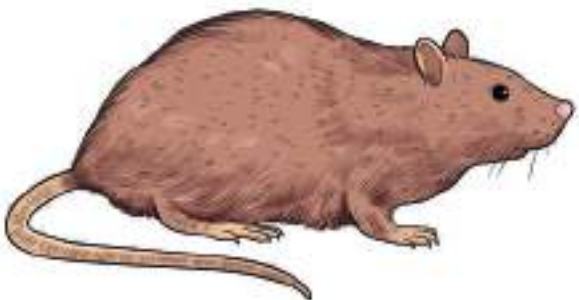
আমাদের চারপাশে যে জীবগুলো দেখি কিংবা যাদেরকে আমরা দেখতেই পাই না এদেরকে আমরা তিনটি ভাগে আলোচনা করতে পারি—উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব। এদের সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আরো বিশদভাবে জানব। তবে তার আগে আমরা জেনে নেবো জীবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। জীব, হোক না উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীব, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:

### ৫.৬.১ শক্তি স্র্জন এবং ব্যবহার

প্রতিটি জীবেরই তাদের জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে শক্তি শোষণ করে এবং সেটাকে খাদ্যে রূপান্তর করে। আবার, প্রাণীর শক্তি গ্রহণ করে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব থেকে।

### ৫.৬.২ প্রজনন

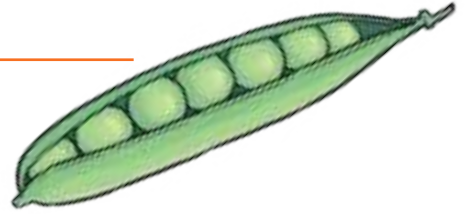
জীব নিজের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। অনেক বহুকোষী জীব, যেমন এই ইঁদুরটির জন্মের জন্য পিতা এবং মাতার প্রয়োজন। বাবা-মা দুজনের প্রত্যেকেই একটি করে বিশেষ কোষ প্রদান করে। বিশেষ কোষ দুটি একত্রিত হয়ে



একটি নতুন কোষ গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কোষটিই পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে একটি নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়।

### ৫.৩.৩ বৃদ্ধি এবং বিকাশ

ছবির মটরশুঁটির মতো অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বীজ পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। প্রতিটি জীবের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন চক্র রয়েছে যা তার আকার, আকৃতি, চলন ক্ষমতা এবং খাদ্যগ্রহণের ধরনে পরিবর্তন আনে।



### ৫.৩.৪ পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া



সরল জীবগুলোও পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। কখনো দেখেছ একটি কেঁচোকে স্পর্শ করা হলে সেটা কেমন তার দেহটাকে গুটিয়ে নেয়?

একই কথা লজ্জাবতী উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার কিছু উদ্ভিদ, যেমন সূর্যমুখী, বেশি সূর্যালোক শোষণের জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।



## ৫.৪ জীবের শ্রেণিবিন্যাস

এই পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীব রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে অনুমান করছেন তাতে এই সংখ্যা প্রায় ৮.৭ মিলিয়ন বা ৮৭ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক ভিন্ন জীবকে আমরা কীভাবে চিনব এবং জানব? এই চিন্তা অনেককেই ভাবিত করেছিল।

এর একটি সমাধান দিয়েছিলেন সুইডিশ উদ্ভিদবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus), যিনি Carl Linnaeus নামেও পরিচিত (১৭০৭—১৭৭৮)। তিনি জীবের নাম ও শ্রেণিকরণের একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনি জীবকে বিভক্ত করেছিলেন তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এই পদ্ধতিটি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিকরণ বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ‘প্রজাতি’ (species), যেখানে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জীবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রজাতি বলতে বুঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মিলসম্পন্ন জীবসমূহকে, যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, যারা পরবর্তী সময়ে নিজেরাও তাদের

মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তান জন্ম দিতে পারে।

একই ধরনের প্রজাতিগুলিকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে—যাকে বলা হয় ‘গণ’ (genus)। যেমন, কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল একই গণ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা আলাদা প্রজাতি।

এরই ধারাবাহিকতায় একই ধরনের ‘গণ’গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ‘গোত্র’ (family)-তে। গোত্র হচ্ছে গণ-এর উপরের ধাপ এবং গোত্রের ভেতরে গণের তুলনায় জীবের মাঝে কম সাদৃশ্য দেখা যায়।

একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গোত্রগুলিকে ‘বর্গ’ (order) এর অন্তর্গত করা হয়। যেমন, কুকুর Carnivora বর্গের প্রাণী। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল সমগোত্রীয় এবং এদেরকে যে বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিড়াল, বেজী ও ভাল্লুকও একই বর্গভুক্ত।

### নিচে ছবিতে শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হলো





সমবর্গের জীবগুলোকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে যার নাম ‘শ্রেণি’ (class)। Carnivora বর্গটি এমন একটি শ্রেণির অংশ যেখানে বাদুড়, শিম্পাঞ্জি এবং তিমির মতো প্রাণীরাও অন্তর্ভুক্ত।

অনেকগুলো শ্রেণি একটি ‘পর্ব’ (phylum) গঠন করে। এই ধাপে, কুকুর, পাখি, সাপ, ব্যাঙ এমনকি মাছও একই পর্বের মাঝে এসে যায়।

কয়েকটি পর্ব মিলে একটি জগৎ বা রাজ্য (kingdom) তৈরি হয়। রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃত এবং বৃহত্তম ধাপ। ছবিতে একটি বিড়ালকে অ্যানিমেলিয়া (Animalia) রাজ্য থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বিড়াল প্রজাতি পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। যদি আমরা মানুষের প্রজাতি বের করতে চাইতাম তাহলে মানুষ মাংসাশী প্রাণি নয় বলে সেটি ম্যামেলিয়া শ্রেণির পর অন্য একটি বর্গভুক্ত হয়ে যেতো। প্রজাপতির মেরুদণ্ড নেই, তাই আমরা যদি একটি প্রজাপতির প্রজাতি বের করতে চাইতাম তাহলে সেটি অ্যানিমেলিয়া (Animalia) রাজ্যের পরই মেরুদণ্ডী প্রাণির জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃক পর্বভুক্ত না হয়ে অন্য একটি পর্বভুক্ত হতো।

যদি আমরা আম গাছের প্রজাতি বের করতে চাই, তাহলে কী করব? অ্যানিমেলিয়া (Animalia) নামটি থেকেই নিশ্চয় তোমরা অনুমান করতে পারছ, এই রাজ্যটি শুধুমাত্র প্রাণি (animal) জগতের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এখানে কোন উদ্ভিদ নেই। উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য অন্য একটি রাজ্য থেকে শুরু করতে হবে, সেই রাজ্যের নাম প্লান্টি (Plantae)। ঠিক একই ভাবে আমরা যদি ব্যাঙের ছাতার প্রজাতি বের করতে চাই তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি রাজ্য থেকে শুরু করতে হবে, এই রাজ্যটির নাম ফানজাই (Fungi)।

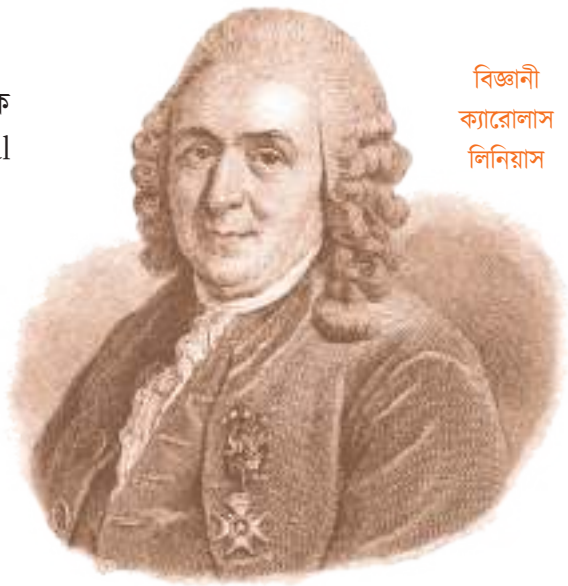


জীবজগতের ছয়টি রাজ্য: অ্যানিমেলিয়া, প্লান্টি, ফানজাই, প্রোটিস্টা, ইউব্যাকটেরিয়া ও আর্কিব্যাকটেরিয়া

ঠিক কয়টি রাজ্য দিয়ে শুরু করলে জীব জগতের সকল জীবকে কোন না কোনোভাবে শ্রেণি ভুক্ত করা যাবে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতর একটু বিতর্ক এবং মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জীবজগতকে সর্বমোট ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। একটু আগেই তোমরা অ্যানিমেলিয়া, প্লান্টি ও ফানজাই এই তিনটি রাজ্যের কথা জেনেছ। অন্য তিনটি রাজ্য হচ্ছে প্রোটিস্টা (Protista), ইউব্যাকটেরিয়া (Eubacteria) এবং আর্কিব্যাকটেরিয়া (Archaea)। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

## ৫.৫ প্রজাতির নামকরণ

বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস গণ এবং প্রজাতির নাম ব্যবহার করে পরিচিত জীবগুলোর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন, যা দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) নামেও পরিচিত। অধিকাংশ জীবের বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন Carnivora শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দের অংশ। Carn অর্থ ‘মাংস’ Vorus অর্থ ‘গ্রাসকারী’। সকল গৃহপালিত বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম *Felis catus*।



বিজ্ঞানী  
ক্যারোলাস  
লিনিয়াস

### অনুশীলনী ?

- ১। কোষের গঠনে কোন কোন অংশগুলো আবশ্যিক বলতে পারো?
- ২। ধরো, তুমি নিজেই কোনো একটা নতুন প্রজাতির মাছ, ব্যাঙ কিংবা পোকা আবিষ্কার করে ফেললে! কী নাম রাখবে এই নতুন প্রাণীর? কেনো?